Missive from Vice Chancellor, 1st March, 2023

আমি আপনাদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর মঙ্গলের চিন্তা ভাগ করে নিতে চাই

বিদ্যাস্থান হিসেবে বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতনের অধঃপতন অপ্রতিহতভাবে ঘটেই চলেছে। এরজন্য দায়ী বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্যগণ, ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ইত্যাদি বিশ্বভারতীর অংশীদার সবাই; এবং তৎসহ তথাকথিত রবীন্দ্রিক ও আশ্রমিকেরা— যাঁরা বিশ্বভারতী থেকে শেষবিন্দু পর্যন্ত ফায়দা নিংড়ে নিয়েছেন অথচ প্রতিদানে প্রতিষ্ঠানটির জন্য কিছুই করেননি। বোলপুর শহরের মানুষেরাও কম দায়ী নন। তাঁদের কাছে বিশ্বভারতী হল গল্পের সেই সোনার ডিমপাড়া রাজহাঁসের মতো। তাঁরা লাভের কড়ির হিসাব নিয়েই মত্ত, কিন্তু দিন দিন ক্ষীয়মাণ সেই 'রাজহাঁস'-এর যত্ন-আত্তি বা পরিচর্যার জন্য তাঁদের কোনও অবদানই পরিলক্ষিত হয় না। বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে এবং স্থানীয় উৎকর্ষকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান সার্বিক অবক্ষয় ও অস্বাস্থ্যের প্রতিবিধানকল্পে তাঁদের একজনকেও বিচলিত হতে দেখা যায় না— এ খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। এজন্যই বিশ্বভারতীতে এখন বিদেশ থেকে তেমন পড়ুয়া আসে না, আমাদের বেশির ভাগ বিদেশি পড়ুয়ারা আসে বাংলাদেশ থেকে। এরথেকে একরকম মালুম হয়, বিদেশি ছাত্রদের আকৃষ্ট করার ক্ষমতা আর বিশ্বভারতী নেই। কাকতালীয়ভাবে প্রায় একই কথা খাটে শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও। 'বিশ্ব'কে আর অধিগত করতে পারছে না বিশ্বভারতী। ২০১৮ সাল থেকে বিশ্বভারতীকে যথার্থ 'বিশ্বভারতী' করে গড়ে তোলার একটা সমবেত প্রয়াস শুরু হয়েছে; যাতে সারাদেশ এবং বিদেশ থেকে শিক্ষকদের এখানে নিয়ে আসা যায়। আশা করা যায়, এর সুফল কয়েকবছরের মধ্যেই ফলতে দেখা যাবে।

এইরকম একটা ধারণা এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে অতীতের মতো আর নেই বিশ্বভারতী। ধারণাটা পুরো ভিত্তিহীন নয়, কারণ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ পরিমাপক সংস্থার(এন.আই.আর.এফ) সূচক অনুযায়ী এর স্থান দিন দিন নীচে নেমে গেছে, এবং দুয়েকটি বিভাগ ছাড়া চাকরির দুনিয়ায় এখানকার ছাত্রদের কর্মসংস্থান বেশ কম হচ্ছে। বিশ্বভারতীর অধঃপতন খোলা চোখে দেখা গেলেও, ভারতমাতার অন্যতম মহান সন্তান গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়া ব্যাধি (যদি ধীর মৃত্যু নাও বলি)-র উৎস কোথায়— তা তেমন সুনির্দিষ্টভাবে কেউ শনাক্ত করতে এগিয়ে আসেননি। নীচের কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিশ্বভারতীর মতো এমন মহৎ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক অধঃপতনের কয়েকটি মূল কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

১। বিশ্বভারতী-সংশ্লিষ্ট সবার বিস্মৃতিপরায়ণতা: বিশ্বভারতীর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত সবার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার নিয়ে আত্মগৌরব বোধ করার একটা সাধারণ প্রবণতা আছে। স্থানীয় ভাষায় এঁদের 'রাবীন্দ্রিক' বলা হয়। তাতে দোষের কিছু থাকত না যদি তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'সযত্নশীলতা', 'সচেতনতা', 'সহৃদয়তা' এবং 'সমানুভূতিশীলতা'-র আদর্শ অনুসরণ করে কবির প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়াতেন; এবং কবির দৃষ্টিতে যাঁরা 'মূঢ়, মূক, ম্লান' মানুষ—তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ানোর সদিচ্ছা দেখাতেন! বিশ্বভারতীর ক্রমিক অধঃপতনের দিকে একবার চোখ বোলালেই বোঝা যায়, বিশ্বভারতীর ভালমন্দের অংশীদারেরা এর অসুখের গোড়াটাকে চিহ্নিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এটা বলা খুব সোজা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্ন নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এর ক্রমবিস্তারী অসুখ নির্মূল করা খুবই কঠিন। এটা সহজ কাজ নয়, রাতারাতি করে ফেলার ব্যাপারও নয়; কেননা এর শিকড় খুব গভীরে প্রোথিত, এবং জোঁকের মতো এই ব্যাধি প্রতিষ্ঠানকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরেছে। তবুও মনে হয় না যে সমস্যাগুলো অনতিক্রম্য, কারণ রবীন্দ্রনাথের মহান চিন্তাভাবনা দিয়েই সেগুলির স্থায়ী মোকাবিলা হওয়া সম্ভব। এই কাজের জন্য কারোর পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে। এরজন্য দরকার শুধু খাঁটি মানুষ হওয়া—যার কিনা খ্যাপা ষাঁড়ের সামনে দাঁড়াবার হিম্মত আছে। সৎ, সাহসী, উদ্যমী ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন চরিত্রধর্মই 'রাবীন্দ্রিক' হওয়ার প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত। এটা ঠিক, ব্রিটিশ উপনিবেশ পর্বে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে বীরভূমের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বস্ব পণ করে বিশ্বমানের এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সময় রবীন্দ্রনাথও কম বাধার সম্মুখীন হননি। তবুও, সেসময়ের সামাজিক ও আদর্শগত প্রতিকূল আবহ, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সংকল্প থেকে কবিকে বিচ্যুত করেনি।

২। অসুখের উৎসসমূহ: আগেই যেমনটা বলা হয়েছে, কাজটা খুব সোজা নয় দুটো বিশেষ কারণে। একে তো বিশ্বভারতীর অধঃপাতে যাওয়ার কারণগুলো বললে অনেকেরই তেমন মিষ্টি লাগবে না। আবার শিক্ষকদের প্রথম কর্তব্য হিসেবে শিক্ষাদানকে মেনে না নেওয়ার অভিযোগকেও এই বলে চালানো যাবে না যে তা অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে ঘটছে। এবং এমন অনেক ছাত্রও আছে যারা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত অগ্রাধিকারের মূল ধারাণাগুলিকে আত্মস্থ করে তুলতে পেরেছে বলে মনে হয় না।— এইজাতীয় মন্তব্যকেও নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য বলা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনমনের জন্য শিক্ষাকর্মীরাও দায়ী— এই অভিযোগও ভিত্তিহীন নয়। এই সবই হল অপ্রিয় সত্য। এগুলো শুনলে হয়তো অনেকেরই ভুরু কুঞ্চিত হবে বটে, তবে এগুলোর একটিও কেউ সহজে অস্বীকার করতে পারবেন না। তাহলে

সমাধানের উপায় কী? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে কোনও জাদুদণ্ড কিংবা আলাদীনের আশ্বর্য-প্রদীপ নেই। যাঁর যে কর্তব্য পালন করার কথা তা যদি তিনি সততার সঙ্গে না করেন তাহলে এর সমাধান অধরাই থেকে যাবে। কোনও কড়া পদক্ষেপ বা দণ্ডপ্রয়োগ করে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে না। শিক্ষকদের ঠিকমতো ক্লাস নিতে হবে, এবং রবীন্দ্রনাথের যে আদর্শ এখানে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল তা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে ছাত্রদেরও এখানকার আচরণবিধি মেনে চলতে হবে যাতে মসৃণভাবে বিশ্বভারতী উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে আবারও আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

ক) শিক্ষাকর্মীদের দায়-দায়িত্ব: সময়টা শিক্ষকদের জন্য তেমন অনুকূল নয়, কারণ তাঁদের বিভাগ-পরিচালনা এবং অনেক বিষয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলাদের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ছাত্রদের অবস্থাও খানিকটা তদ্রূপ। বিশ্বভারতী এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিসের মনোভাব অনেকটা এইরকম তৈরি হয়েছে যে, তাঁদের ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অচল এবং তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরিহার্য। অন্য এক পক্ষ—রাবীন্দ্রিক ও আশ্রমিকদেরও বুঝতে হবে যে তাঁদেরও কথা আর কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। স্বঘোষিত রাবীন্দ্রিক ও আশ্রমিক অনেকই আছেন, যাঁরা নিজেদের এই পরিচয়টা দিতে ভালবাসেন বটে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁদের কমই দেখা মেলে। প্রকৃত রাবীন্দ্রিক ও আশ্রমিকেরা সবার অলক্ষ্যে থেকে নিঃশব্দে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কাজ করে গিয়েছেন। এ হল মানবতাবাদী জীবনদৃষ্টিরই একটি অমোঘ পাঠ। এরকম ব্যক্তিদের কাছে বিশ্বভারতী কেবল একটা ডিগ্রি বিতরণ করা প্রতিষ্ঠানমাত্র নয়, এ হল বিশ্বমানবতার বিশেষ ধারাস্রোতে স্নাত হওয়ার আধার।

খ) বিশ্বভারতী হল সেরকম গুটিকয় প্রতিষ্ঠানের একটি যেখানে প্রথম প্রজন্মের, ভাত-আনতে-পান্তা-ফুরোনো অনেক ছাত্র পড়তে আসে। বস্তুত, এটা রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শেই বলা হয়েছে; এবং তিনি এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে অশিক্ষা ও অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৃত্তিমূলক ও অন্তর্জাগৃতিময় শিক্ষার মাধ্যমেই গড়ে তোলা যায় উপযুক্ত সামাজিক প্রতিষেধ। ছাত্রদের সামাজিক অবস্থার তেমন রকমফের হয়নি, তবে আগের তুলনায় তাদের মধ্যে নৈতিকতা গুণটি অনেকাংশে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? এর সোজা উত্তর হল, এরসঙ্গে মোটের উপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রশ্নটি জড়িত, যা মানুষের আচরণের ছাঁদ তৈরি করে। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা অবক্ষয় সূচিত হয়েছে। শিক্ষা হোক, কলা বা নন্দন হোক; সাহিত্য, রাজনীতি, অথবা মানুষের সৃজনশীলতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই অবক্ষয়। এটি একরকম বৈশ্বিক প্রবণতা।

গত শতকের শেষ বিশ্বযুদ্ধে মানবতার নিদারুণ লাঞ্ছনার পরও বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি মানবতা এবং মানবিক কর্তব্যবোধের ক্ষেত্রে অসংবেদনশীল রয়েই গেছে। এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আমাদের যুবদের মধ্যে, যারা কিনা আমাদের ভবিষ্যতের নেতা। এই হতাশাজনক পরিস্থিতির জন্য ছাত্রদের দায়ী করলে চলে না। তাদের দোষ দিতে গেলে সমানভাবে দোষী বলতে হয় তাদের পরিবার, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষকদের; যাঁদের উপর বিশেষভাবে নতুন ভারত গঠনের দায়িত্ব; এবং সাধারণভাবে মানবতা রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

কথাগুলো নিতান্ত যুক্তিহীন নয়। একটি শিশুর সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণ গড়ে ওঠে প্রথমত তার পরিবার থেকে, তারপর সে যায় স্কুল, কলেজ বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে। সেখান থেকে সে আত্মস্থ করে আরও অনেক কিছু। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এই প্রতিটি পর্যায়ের মধ্যে অনেক অনেক ফাঁক রয়ে গেছে যা দুষ্টক্ষত হয়ে ওঠার আগেই দ্রুত উৎপাটিত হওয়া দরকার। এটা একইভাবে দুর্ভাগ্যজনক যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতিক্রমীরকমভাবে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সমর্থ হচ্ছে না কারণ শিক্ষকরাও আর ‘গুরু’র ভূমিকা পালন করতে মোটের উপর ব্যর্থ হচ্ছেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শের গুরুত্ব খুব বেশি প্রাসঙ্গিক। ১২ নভেম্বর ১৯০২ তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, শিক্ষার্থীদের আচরণের বিচ্যুতি ঘটছে কারণ মোটের উপরই যথাযথ মানবিক মূল্যবোধ ও আচার-আচরণের চালিকাশক্তি হিসেবে শিক্ষা তার ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষকরা কেবল মনোযোগ করেন সিলেবাসে তাঁর জন্য বরাদ্দ অংশটুকুর উপর; এবং এইভাবে তিনি কার্যত কেবলমাত্র একজন ‘নির্দেশক’-এর ভূমিকাটুকুই পালন করেন। তাঁরা পারতপক্ষে ক্লাসরুমের শিক্ষার বাইরে বেরোতে পারেন না, কারণ এই অভ্যাসই তাঁদের মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে আছে। তাহলে ছাত্ররা শিখবে কোত্থেকে? রবীন্দ্রনাথ যে মূল্যবোধের শিক্ষার উপর এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা থেকে কাজে-কাজেই ছাত্ররা বঞ্চিত হয়। তাতে যা হবার তাই হচ্ছে। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের কথাবার্তার সময় (যদি ঝগড়াঝাঁটি নাও হয়) কোনটা বলা বা করা ‘উচিত’ আর কোনটা ‘অনুচিত’— সেই সীমারেখাটা তারা ভাল করে বুঝতেই পারে না। যা সবচেয়ে খারাপ তা হল কিছু তথাকথিত শিক্ষক এব্যাপারে তাঁদের দায় এড়াতে পারেন না, কেননা তাঁরা ছাত্রদের প্ররোচনা জুগিয়ে আমোদ পান, এবং পরিস্থিতি জটিল করে তোলেন। ফলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে এই বিষময় জোটবদ্ধতার কারণে। সবচেয়ে ভয় ও চিন্তার ব্যাপার হল, এরজন্য ছাত্র বা তাদের অভিভাবকেরা বারবার এমন ঘটনা ঘটিয়ে দিব্যি অনুতাপহীন থাকতে পারেন। তাঁদের যৌথ অন্যায্য দাবিকে

ন্যায্য প্রমাণ করবার জন্য তাঁরা প্রাণপাত করেন, অথচ ছাত্রদের লেখাপড়ার দিকে নিয়ে যান না, যা খুবই নিন্দনীয়। এই হল ট্রাজেডি যে বেপথুরা এসব করে আনন্দ পায় যা আচরণের দিক থেকে একেবারেই অন্যায়; এবং ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্যই অনভিপ্রেত।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীরা যথাযথ অফিসের কাজ না করলে ছাত্র-শিক্ষকরা দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তাঁদের কর্তব্য করতে পারবেন না। এটা একটা চালু অভ্যেস যে অফিসের বেশ কিছু কর্মী তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কাজ করতে আদৌ আগ্রহী নন, কিন্তু অফিস টাইমের পর অতিরিক্ত সময়ের কাজ করতে বিশেষ আগ্রহী— কারণ তাতে ওভারটাইম ভাতা পাওয়া যায়! আমার ধারণা ছিল তাঁদের কাজের চাপ বুঝি খুব বেশি, তাই তাঁদের ওভারটাইম করতে হয়। দ্রুত আমার ভুল ভাঙল। আমি দেখলাম, অফিসে বসে তাঁরা অফিসের বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। স্বভাবতই তাঁদের নির্ধারিত কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এবং কাজের ওই মন্থরগতি বাবদ মাসিক বেতনের উপর যুক্ত হয় ওভারটাইমের ভাতা। আমি যখনই বুঝতে পারলাম, কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করলে ওভারটাইম অপ্রয়োজনীয়, আমাকে দৃশ্যত 'অপ্রিয়' একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হল যে কর্মীদের দীর্ঘদিনের এই অনৈতিক 'প্র্যাকটিস' এবার বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে আমরা জনগণের অর্থ নয়ছয়ের একটা বিহিত করতেই অনেক শিক্ষাকর্মী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে শুরু করলেন যে তাঁদের বাড়তি আয়ের পথে কাঁটা ফেলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের বঞ্চিত করেছেন। এই টাকা উপার্জন সত্যি খুব অসৎ উপায়ে হত।

একইভাবে অবকাশমূলক ভ্রমণ ভাতা(এল.টি.সি)-র টাকাও নানা অসদুপায়ে আত্মসাৎ করা হচ্ছিল। এল.টি.সি বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাকা ও ছুটি নিয়েও অনেকে ভ্রমণ করতেন না। আমাদের সহকর্মীদের এই অপকর্মটি অডিট টিম প্রকাশ্য করে; এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুদসমেত সেই টাকা পুনরুদ্ধার করে। এই পদক্ষেপের ফলেও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে আমার পূর্বসূরিরা সবকিছু জানা সত্ত্বেও এসব ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে ছিলেন। তার মানে, তিতো ওষুধটা আমাকেই গিলতে হয়, আর তাঁরা কিনা দিব্যি বিশ্বভারতীর সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠলেন!

ঘ) ছাত্র এবং/অথবা গুণ্ডারা: এরকম একটা শিরোনাম দিয়ে এই উপঅধ্যায়টা শুরু করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত বলার আগে যেটা আমার বলা দরকার বলে মনে হচ্ছে তা হল ছাত্র নামধারী কাদের আমি 'গুণ্ডা' বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে চাইছি? দুর্ভাগ্যবশত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনগুলি এই প্রজাতির প্রাণীদের জ্বালায় অস্থির হয়ে

উঠেছে যারা একশ্রেণির রাজনৈতিক অভিভাবকের প্ররোচনায় এমন সব কাণ্ড করে যে প্রত্যেক সংবেদনশীল মানুষের মনে হতে থাকে, জাতিগঠনের শিক্ষার অগ্রাধিকারের ঘোষণার নামে তাঁদের ভাঁওতা দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত অফুরান। শিক্ষক, অধ্যক্ষ, এমনকি উপাচার্যদের মানসিক ও শারীরিক নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের কথা শোনা যায় না এমন নয়।শিক্ষা-প্রশাসকদের সেই যন্ত্রণা সহ্য করে যেতে হয় যেহেতু তাঁরা স্বেচ্ছায় এই পেশা বেছে নিয়েছেন। আমি বরং বিশ্বভারতীতে আমার কার্যকালের সূচনা থেকে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রসঙ্গটা গুটিয়ে নিই। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে যাওয়ার আগে আমি স্মরণ করতে চাই আমার শিক্ষকের সেই চেতাবনি যে, এই পেশায় যেতে হলে গায়ের চামড়া মোটা হতে হয়! আমি তখন তাঁর কথার মর্মার্থ ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি; যাঁর রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পর্বে উপাচার্যের দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতা ছিল। কথাটা আমি অচিরেই উপলব্ধি করলাম যখন একদল ক্ষিপ্ত ছাত্র ও শিক্ষাকর্মী আমাকে বাছা বাছা 'সম্বোধন'-এ ভরিয়ে দিল। আমি এখানে অবশ্যই বলব, একদল শিক্ষকের ওই একইরকম (যাঁদের আচরণ ও কাজের ধারার জন্য 'গুণ্ডা' বললে অন্যায় হয় না।) প্ররোচনা না থাকলে ওই পথভ্রষ্ট ছাত্ররা দাঁড়াতেই পারত না। ওই ছাত্রনামা গুণ্ডারা তাদের বেপথু 'অভিভাবক'-দের নির্দেশ অনুসারে উপাচার্যের ঢোকা-বেরনোর পথে তালা ঝুলিয়ে উপাচার্যকে বন্দি করে এই বলে যে, যতক্ষণ না তাদের সব অবৈধ দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, অথবা উপাচার্য পদত্যাগ করছেন ততক্ষণ ওই আটক জারি থাকবে। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিটা বেশ হাস্যকর কথা, কারণ এরা বোধহয় জানে না যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়োগ করেন দেশের রাষ্ট্রপতি। অথচ তারা এমন ভাব করছিল যেন তারাই আমাকে নিয়োগপত্র দিয়েছে এবং তা কেড়ে নেওয়ার অধিকারও বোধহয় তাদের আছে! কী নির্বুদ্ধিতা! এটা অবশ্য ঘটনা যে বিশ্বভারতীর অনেক পূর্বতন উপাচার্যই তাঁদের পাঁচবছরের কার্যকাল সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা পদত্যাগ করে শান্তির আশায় শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেছেন।সম্ভবত, এদের(আন্দোলনকারীদের) ঔদ্ধত্যের মূলে ছিল ওই আত্মবিশ্বাস। ওরা ভেবেছিল আমার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারলেই আমিও দৌড়ে পালাব। আমাকে ওরা ভুলভাবে জরিপ করেছিল। ছাত্র নামধারী ক্যাম্পাসের এইসব গুণ্ডাদের বিশ্বভারতী থেকে নিষ্কাষণ করা একটা জীবনের লক্ষ্য। এটা তাদের জন্য খুবই মর্যাদাহানিকর যে তারা নির্লজ্জের মতো তাদের পক্ষে যুক্তি সাজাতে গিয়ে মিথ্যাচারণ করছে। যা ধোপে টেঁকে না তা-ই বলার চেষ্টা করছে। একজন ছাত্র এখানে ভর্তি হতে চেয়ে উপাচার্যকে নীতিবিরুদ্ধ আক্রমণ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, ওই একই

ছাত্র স্থানীয় থানায় একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রদের 'নীতিবিরুদ্ধ গালাগাল' দেওয়ার ও 'অপমান করার' অভিযোগ এনেছিল। পুলিস তৎক্ষণাৎ তদন্তের জন্য তার অভিযোগটি গ্রহণ করে। ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে ওই শিক্ষককে দু'সপ্তাহ কারাবাসে কাটাতে হয়। অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে জেলের সাজা ন্যায়সংগত ছিল বলতে হবে। বিষয়টি এখন আদালতের বিচারাধীন। ছেলেটি আপাতভাবে একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে দেখে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। আমি খুব বিস্মিত হলাম যে সেই ছেলেটিই উপাচার্যকে নীতিবিরুদ্ধ আক্রমণ করে তার সেই 'প্রতিবাদী' চেতনাকে অচিরেই জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলল! এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে এই পথভ্রষ্ট ছাত্রেরাও নিজেদের 'রাবীন্দ্রিক' বলে জাহির করে। তাতে বোঝা যায়, নিজের সুবিধামতো, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এক-একজনের কাছে 'রাবীন্দ্রিক' কথাটার মানে এক-একভাবে বদলে বদলে যায়। কোনও মাপকাঠিতেই কি এটা মানা যায়? যাঁরা রবীন্দ্র-ভাবাদর্শ আত্মস্থ করতে পারেননি তাঁদের বিশ্বভারতীর সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত থাকার কোনও নৈতিক অধিকারই নেই।

চ) বিশ্বভারতীতে পৌষমেলা না হওয়া নিয়ে ভুল ধারণা: বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের কাছেই এই মেলা না করতে পারাটা খুব যন্ত্রণার বিষয়। তবু বিশ্বভারতী সাহস করে এ-কাজে এগিয়ে যেতে পারল না; যে মেলা এইমুহূর্তে দুজন সদস্যবিশিষ্ট শান্তিনিকেতন ট্রাস্টিরই করার কথা, এবং কেন বর্তমান উপাচার্য ট্রাস্টি হতে সম্মত হননি তাও ট্রাস্টি দুজনের অজানা নয়। তবু বিশ্বভারতী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী, এবং তৎসহ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের সহযোগিতা নিয়ে এই বিরাট মাপের মেলার আয়োজন সম্পন্ন করতে অগ্রণী হয়েছিল। মাঝে কোভিড অতিমারীর কারণে মেলা আয়োজন করা যায়নি। ২০২২ সালে বিশ্বভারতী মেলার আয়োজন করতে আগ্রহী ছিল, এবং সেইমতো কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রককে ২০১৯ সালের অনুরূপ আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার আবেদনও করেছিল বিশ্বভারতী। মন্ত্রক সাহায্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় এবং এব্যাপারে রাজ্যসরকারের কাছে আবেদন করতে বলে। জুন ২০২২ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে বিশ্বভারতী সেই মোতাবেক চিঠি দেয়; কিন্তু রাজ্য থেকে তার কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

এখন একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বলা দরকার যে কেন বিশ্বভারতী এমন একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মেলা করতে অগ্রসর হল না। জাতীয় পরিবেশ আদালত (এন.জি.টি) এবং অন্যান্য পরিবেশ-প্রতিষ্ঠানের নির্দেশাবলি ও পরিবেশ সুরক্ষার সদিচ্ছা মাথায় রেখেই আমরা একসময় খুব উৎসাহের সঙ্গে মেলা করতে এগিয়েছিলাম। সবচেয়ে দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক 'পুরস্কার'

আমাদের জুটল রাজ্য পুলিসের কাছ থেকে। তাঁরা উপাচার্য এবং তাঁর অনেক সহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন(এফ.আই.আর), যখন মেলার নির্ধারিত চারদিনবাদে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ অনুসারে তাঁরা মেলা ভাঙার প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। তাছাড়া, মেলার কোনও স্টলদাতা মেলাপ্রাঙ্গণ পরিষ্কারের কাজে এগিয়ে আসেননি, যদিও মেলা থেকে তাঁরা লাভের কড়ি ঘরে তুলেছেন। জাতীয় পরিবেশ আদালত ২৫ লাখ টাকা এবং রাজ্য দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ ১০ লাখ টাকা জরিমানা করে বিশ্বভারতীর। আর আমাদের মেলাপ্রাঙ্গণ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে খরচ হয় আরও ৫ লাখ টাকা।

বিশ্বভারতীকেই মেলার আবেদন করতে বলা হোক—এই মর্মে একজন হোটেল ব্যবসায়ী কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন। কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ ৬ ডিসেম্বর ২০২২ তাঁদের রায়ে বিশ্বভারতীর যুক্তিগুলিকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে, এবং বিচারকেরা মন্তব্য করেন যে স্থানীয় প্রশাসনের; বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিস বিভাগের সাহায্য ছাড়া এমন বিশালাকৃতির মেলার আয়োজন করা বিশ্বভারতীর পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা এই রায় বিস্তৃতভাবে পড়তে চান তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে তা পড়ে নিতে পারেন।

মতান্তরে কেউ হয়তো বলতে পারেন, বিশ্বভারতীর পক্ষে হাইকোর্ট যে রায়ই দিক না কেন, বিশ্বভারতীর কি মেলার আয়োজন থেকে সরে আসা উচিত হয়েছে? এটা ঠিক যে স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ এবং স্থানীয় মানুষের উপার্জন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মেলার ভূমিকা রয়েছে। এমনকি, বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত সবাই এটা বোঝেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পুত্র গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মহতী ভাবনার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের প্রতি উত্তরাধিকারবোধ সত্ত্বেও আয়োজকদের মনস্তাপের কারণ ঘটেছে ২০১৯ সালের বিরূপ ঘটনাসমূহ। বিশ্বভারতীর পর্যবেক্ষণের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে দূষণমুক্ত মিলনভূমি হিসেবে প্রাণপাত পরিশ্রম করে মেলার আয়োজন করতে গিয়ে আনন্দ-ফূর্তির বদলে শুধু যন্ত্রণা আর বেদনা পেয়েছেন আয়োজকেরা। বরং, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই এমন বিশাল কোনও আয়োজন সামলানো অসম্ভব। সেইজন্যই সবচেয়ে বড় দুটো মেলা কুম্ভ ও গঙ্গাসাগর— যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার আয়োজন করে থাকে।

এই কথাগুলো বলার অর্থ এই নয় যে শুধু থই না পাওয়া কতকগুলি সমস্যার কথাই বারবার বলে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। আমরা বলতে চাইছি কতকগুলি দীর্ঘস্থায়ী মূল জটিলতা পূর্ববর্তী জমানায় কেউই যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করে যাননি। তার অজস্র কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সে কথায় কাজ নেই। যা দরকার তা হল এই অবস্থার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা, অন্তরায়গুলি চিহ্নিত করে তার প্রতিবিধান করা এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত সবার অসন্তোষের মূল উপড়ে ফেলে এই জটিল অবস্থা থেকে বিশ্বভারতীকে মুক্ত করা। আমার এই উক্তির সপক্ষে বড়জোর একপ্রস্থ সমাধানের প্রস্তাব আমি এখানে দিতে পারি; যদিও এটা নির্ভর করছে কে কীভাবে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করবে এবং তার সমাধানের বিবেচনা করছে তার উপর।

এভাবে অনেক সমাধান-প্রস্তাব আসতে থাকুক। তার মধ্যে অন্যতম হতে পারে এইরকম কিছু:

প্রথমত, যেটা আবশ্যিক পূর্বশর্ত তা হল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য ও কর্মের মাধ্যমে বিশ্বভারতীর আদর্শের মূলসুর বেঁধে দিয়েছিলেন, তেমন একটা উপযুক্ত মনের কাঠামো তৈরি করা। খুব বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে তাঁর রচনা পড়লে এবং তাঁর মতো একজন নিত্যসচল মনীষীর সযত্ন মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, তিনিও কখনও কখনও হতাশ হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর *চারিত্রপূজা* (১৮৯৫) এবং ১৯৩৭ সালে প্রাবন্ধিক সজনীকান্ত দাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকার; যা সজনীকান্তের *কর্মী রবীন্দ্রনাথ* বইতে রয়েছে, তা পড়লেই এটা বোঝা যায়। গুরুদেবের মূল বক্তব্যটি সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক। তাঁর আক্ষেপ যে তিনি সবার মধ্যে বিশ্বভারতীর প্রতি নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনের সুর জাগিয়ে তুলতে পারেননি। তার বদলে, যা তাঁকে সবচেয়ে হতাশ করেছে তা হল, দেশের মানুষ বিশ্বভারতীর নামে একান্তভাবে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। এবং, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সূচনাকাল থেকে কখনও তাঁর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুতও হননি। তিনি জানতেন যে যাঁরা তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন তাঁদের সবার মনের গড়ন একইরকম নয়। কখনও-সখনও হতাশ হলেও তিনি তাকে খুব বেশি মনের মধ্যে প্রশ্রয় দেননি। বরং তিনি তাঁর লক্ষ্যের বিপরীত মুখে চলা লোকজনদের সম্মানই করতেন কারণ তার থেকে তিনি তাঁর লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার অনেক রসদ পেতেন।

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের কাছ থেকে এই শিক্ষা নিয়ে আমি আজকের বিশ্বভারতীর ভালমন্দের সব অংশীদারের কাছে উত্তরাধিকার সাধনের জন্য নীচের এই কয়েক দফা উপলব্ধি ও প্রস্তাব উল্লেখ করেছি। প্রথমত, যেহেতু ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ ও জাতিগত পরিচিতি ইত্যাদি প্রভেদ সরিয়ে রেখে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সেজন্য এটা কাম্য যে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সবাই গুরুদেবের আদর্শের প্রতি সম্মান জানিয়ে, নানারকম মতভেদ সরিয়ে রেখে, একত্রিত হবেন। সেইসব সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়গুলির প্রতি আমাদের সবার আগে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে যেগুলি বিশেষভাবে কবি চিহ্নিত করেছিলেন প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য, এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের চারপাশের দত্তক নেওয়া গ্রামগুলির মঙ্গলসাধনের জন্য। ঔপনিবেশিক সময়ের প্রতিকূল বাতাবরণে এই পদক্ষেপ ছিল সবাইকে একত্রিত করার চেষ্টা। এই নীতি অনুসরণ করে এখন দরকার মানুষের মধ্যে পরস্পর সহযোদ্ধার ভাব প্রসারিত করা, যার অভাব ভারতের ঐক্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আজ প্রধান অন্তরায়। কবি মনে করতেন, ভারতেরই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ হিসেবে বিশ্বভারতীতে তাঁর লক্ষ্যপূরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রভূত সুযোগ আছে। উপনিষদের দুটি মন্ত্র বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এবং 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্'(সমগ্র বিশ্ব এক-পরিবার যা নীড়ে এসে মিলিত হয়েছে)। এখানে প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় হল 'প্রত্যেকের তরে প্রত্যেকে আমরা'। এ হয়তো খুব নতুন কথাও নয়, বস্তুত উপনিষদ্ থেকেই এই মূল্যবোধ আমরা অর্জন করেছি। দ্বিতীয়ত, বিশ্বভারতীই আমাদের শিখিয়েছে অধিকার বোধের তুলনায় কর্তব্য বোধের গুরুত্ব কতখানি। ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৫১ বি(মৌলিক কর্তব্য) গৃহীত হওয়ার বহু আগে রবীন্দ্রনাথ সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষকে কর্তব্য/অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তুলেছিলেন যাতে তারা দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। একজন নিত্যসচল চিন্তাধারার মনীষী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণত আত্মনিয়োজিত ছিলেন। যেজন্য তিনি এত নতুন নতুন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করে তাঁর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লক্ষ্য পূরণ করে চলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এটা সম্ভব যদি কেউ আর্তের সেবায় অন্তর থেকে আত্মনিবেদন করে। এ খুব দুর্ভাগ্যজনক যে এই রাবীন্দ্রিক মূল্যবোধ ও মতাদর্শ বোধহয় বিশ্বভারতীর অর্থে যাঁদের গ্রাসাচ্ছাদন হয়, তাঁদের চেতনা থেকেও হারিয়ে গেছে। এখন 'রাবীন্দ্রিক' হওয়া অবশ্য একটা সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন হয়েছে দাঁড়িয়েছে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয়ত, আগের মতো আর নেই বিশ্বভারতী। তার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সম্ভবত তার ইতিহাসের মধ্যেই রয়ে গেছে অনেক ফাঁকচিহ্ন। কেউ কেউ হয়তো

অনেক উদাহরণ দিয়ে বলবেন, আশ্রমিক এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে যাঁরা তখন এসেছিলেন তাঁদের মধ্যেই রবীন্দ্র-ভাবাদর্শ সেভাবে আত্মস্থ হয়নি— আর প্রতিষ্ঠানটির বিচ্যুতির অন্যতম প্রধান কারণ সেটাই। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল, বিশ্বভারতীর আদর্শবিচ্যুতি তারই ফলশ্রুতি। পরিশেষে বলি, বিশ্বভারতীর সবকিছু হারিয়ে গেছে; কিংবা তার ভবিষ্যৎ বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই— এমন কিছু প্রতিপন্ন করা এই বার্তালাপের উদ্দেশ্য নয়। বরং, বিশ্বভারতীর প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমাদের এটাই নিশ্চিতভাবে তুলে ধরা উদ্দেশ্য যে বিশ্বভারতীর উত্থান আবার শুরু হয়ে গেছে। কারণ, (ক) এর অবনমনের কারণগুলির উৎস চিহ্নিত করা গেছে। এবং (খ) প্রবল বিরোধী অপশক্তির বাধা সত্ত্বেও সমবেত চেষ্টায় সমস্যাগুলোর প্রতিবিধান করা হয়েছে। তাতে সেইসব অপশক্তি আরও বেশি মারাত্মক হয়ে উঠলেও তারা জানে যে তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। পরিশেষে আমি বার্তালাপ এই সদর্থক বার্তা দিয়ে শেষ করব যে, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতাকেও তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার সময় এমন অনেক বাধা ঠেলে এগোতে হয়েছিল। তিনি তার পরিপ্রেক্ষিতে কী বলেছিলেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যখন বিশ্বভারতীর জন্য তাঁর আত্মীয়, অনুরাগী ও নিকটজনেদের কাছে অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন তখন তাঁরা নির্বিকার ছিলেন। সত্তরের ঘরে যখন কবির বয়স তখন ভারতের নানাপ্রান্তে অর্থসংগ্রহ করার জন্য তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী উদ্যোগী হয়ে ৬০,০০০ টাকা জোগাড় পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের মহৎ উপকার করেছিলেন। তাঁর জীবনের মহামূল্যবান আধার ও আশ্রয় বিশ্বভারতীকে রক্ষা করার জন্য তিনি যে গান্ধীজিকেই অনুরোধ করবেন— তাতে তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এভাবেই বিশ্বভারতী তার সংকট কাটিয়ে উঠেছিল এই বাগধারা সত্য করে যে— 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।' এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে আমাদেরও বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও সততা থাকলে বিশ্বভারতী আবার অচিরেই তার অতীত গৌরব ফিরে পাবে; এবং তার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

March, 2023

বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী, উপাচার্য

বিশ্বভারতী